



হরিশংকর জলদাস

## এক নজর

দুটো বাড়ি, পাশাপাশি। সেনবাড়ি আর ধরবাড়ি। মাঝখানে পাঁচিল, মাথা সমান। দুই বাড়ির মধ্যে বন্ধুত্ব ছিল, আগে। ভালো রান্না হলে এ বাড়ির তরকারি ওবাড়িতে যেত, শীতে ওবাড়ির পিঠে এবাড়িতে আসত, আগে। এখন আসে না। আগে সেনবাড়ির ছেলেপুলেরা ধরবাড়ির উঠানে খেলতে যেত, এখন যায় না। ধরবাড়ির ছোটরা সেনবাড়িতে

খেলতে খেলতে খাটে ঘুমিয়ে পড়ত, সেনগির্নি কোলে করে বাচ্চাটিকে ধরবাড়িতে পৌছে দিতেন, এখন দেন না। দুবাড়ির মাঝখানে যে এখন কংক্রিটের দেয়াল।

সেনবাড়ির কর্তা প্রতুল সেন, চন্দ্রবিকাশ ধর ওবাড়ির গার্জেন। প্রতুলবাবু টিঅ্যান্ডটি'র কর্মকর্তা আর ধরবাবু অ্যাডভোকেট। একজন নন্দনকাননে অফিস করেন, অন্যজন চট্টগ্রাম কোর্ট বিল্ডিংয়ে প্রাকটিস করেন। দু'জনের মধ্যে গলায় গলায় ভাব। ছুটিছাটার দিনে



গল্প

একসঙ্গে বসে ধর আর সেনে গল্প হয়, সুখ-দুঃখের কথা বিনিময় হয়। সেনবাবুর ফলদ গাছের প্রতি বড় টান, বাড়ির চারপাশে গাছ লাগান। ধরবাবুর গাছের প্রতি তেমন টান নেই। বলেন, 'গাছটাছ লাগিয়ে কী হবে? শুধু পাতা-পুতার আবর্জনা। তার চেয়ে খালি জায়গা ভালো।

আলোবাতাসের অবাধ খেলা।'

সেনবাবু নাছের। ধরবাবুকে গাছ লাগাতেই হবে। ডবল ডবল গাছ কেনেন। একটা এবাড়িতে লাগালে আরেকটা ধরবাড়িতে লাগান। গাছ বড় হয়। এবাড়ির গাছের জল ওবাড়ির সীমানায় যায়। ধরবাড়ির নারকেল গাছের কাঠবিড়ালি খাওয়া কচি ডাব সেনবাড়ির টিনের চালে পড়ে। সেনবাড়ির গির্নি উঠানে দাঁড়িয়ে কাঠবিড়ালি তাড়ান, 'শ শ! হুশ! যা যা মরার কাঠবিড়ালি।' তারপর গলা উঁচিয়ে বলেন, 'ও শ্যামাদি, কাঠবিড়ালি তো সব নারকেল খেয়ে শেষ করল।'

কালক্রমে উভয় বাড়ির ছেলেপুলেরা বড় হতে লাগল। প্রাইমারি স্কুল পেরিয়ে হাইস্কুল। তারপর কলেজ। উভয় বাড়ির জৌলুস বাড়তে থাকে। বেড়ার ঘরের জায়গায় একতলা বাড়ি তোলেন ধরবাবু। আর প্রতুল সেনের ভিটেয় ওঠে দোতলা বাড়ি। তাঁর ইনকাম বেশি। ঘুষঘাষের সুযোগ সুবিধেও বেশি। ধনের বৈষম্য যা-ই হোক না কেন, মনে বৈষম্য হয় না কখনো। পারিবারিক সম্পর্ক আগের মতো অটুট থাকে। সেনবাবুর তিন ছেলে, এক মেয়ে। ধরবাবুর একটাই সন্তান, ওই প্রভাস চন্দ্র ধর। কল্যাণ সেন ছাড়া প্রতুলবাবুর আর দুটো ছেলেই আকাজের। কল্যাণ বড়, মেজটা উচ্চ মাধ্যমিক পাস করে আর পড়ল না। ছোটটা হাবাগোবা। ঠেলেঠেলে দশম শ্রেণি পর্যন্ত এগিয়েছিল। মেয়ে শান্তি ভীষণ সুন্দরী। মাধ্যমিক পাসের পর এক কানাডানিবাসী বর বড় আগ্রহী হয়ে উঠল। মেয়ে



গল্প

ভবিষ্যতের কথা চিন্ত করে ওই প্রবাসীকেই মেয়ে বিয়ে দিলেন সেনবাবু। কল্যাণ সেন ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করল, চুয়েট থেকে। নামকরা একটা প্রাইভেট ফার্মে উঁচু বেতনে চাকরি পেল কল্যাণ।

এক.

প্রভাস আর্টস নিয়ে লেখাপড়া করল। উচ্চ মাধ্যমিক পাস করার পর অনার্সে ভর্তি হল, বাংলায়। ক্রমে অনার্স এমএ পাস করল প্রভাস। বিসিএস দিয়ে সরকারি কলেজে অধ্যাপনার চাকরিও পেল। কল্যাণের মাঝারি হাইট, সুঠাম দেহ। উজ্জ্বল রং। চেহারায় একটু কঠোর কঠোর ভাব। সেটা জন্মগত। রাগী নয় সে, তবে চেহারা রাগী রাগী। প্রভাস দীর্ঘদেহী। স্বাস্থ্য ভালো। কল্যাণের মতো বনেদি চেহারা নয় তার, তবে একধরনের স্নিগ্ধ কোমলতা তাকে সর্বদা ঘিরে রাখে। তার উন্নত নাসা। নাকের দু'পাশে উজ্জ্বল দুটো চোখ। চোখের সৌন্দর্যের জন্যই শুধু প্রভাসকে ভালোবাসা যায়। কম কথা বলা, সৌম্য আচরণ প্রভাসের বাড়তি অনুষ্ণ।

কল্যাণ আর প্রভাসের মধ্যে রেযারেশি, ছোটবেলা থেকে। স্কুলের পড়ালেখায় কল্যাণ কিছুতেই প্রভাসকে পেছনে ফেলতে পারত না। অন্যান্য সাবজেক্টে মাঝে মধ্যে এগিয়ে থাকলেও ইংরেজি আর গণিতে প্রভাসকে অতিক্রম করতে পারত না কল্যাণ। এজন্য তার মনে চাপা ক্রোধ। সেই ক্রোধ এক বিকেলে বেরিয়ে এল।

সবে নাইনে উঠেছে তারা। একই স্কুলে, একজন সাইপে আরেকজন আর্টসে। শীত বিকেলে স্কুলমাঠে ব্যাডমিন্টনের আসর বসেছে। সিনিয়ররা খেলা ছেড়ে দিলে কল্যাণ আর প্রভাস ব্যাড হাতে নিল। দুজন দুদিকে দাঁড়াল। অল্পক্ষণের মধ্যে খেলা জমে উঠল। দুজনেই চৌকষ। তবে প্রভাসের খেলায় কারুকার্য বেশি। দর্শকও জুটে গেল অনেক। উভয়েই এক এক সেটে জয় পেল। তৃতীয় সেট চলছে। দর্শকরা উত্তেজিত। ঘন ঘন হাত তালি দিচ্ছে। কেউ এদিকে, কেউ ওদিকে। প্রভাসের পক্ষেই যেন হাততালি বেশি। দর্শকের উত্তেজনা প্রভাস-কল্যাণের মধ্যে সংক্রামিত হল। মরণপণ লড়াইয়ে মগ্ন হল উভয়ে। এ চাপ দিলে ও ফিরিয়ে দিচ্ছে। ও নেট ঘেঁষে কর্ক ফেলতে চাইলে এ ত্বরিত কেস তা ওপারে পাঠিয়ে দিচ্ছে। একটা সময়ে অবস্থা এমন দাঁড়াল যে, কেহ কারে নাহি চিনে সমানে সমান। তৃতীয় সেটে জয় পেল প্রভাস। কল্যাণ মুখ গোমড়া করে মাঠ ছাড়ল। সেই থেকে রেযারেশি আরও বেড়ে গেল।

একদিন ধর-দম্পতি সিদ্ধান্ত নিলেন- ছেলেকে বিয়ে করবেন। ছেলে তো এখন সরকারি মহিলা কলেজে পড়ায়। বেতন কম পায় না। প্রভাসের বয়সও উনত্রিশ পেরিয়ে গেছে। কথা বলে ধরগিমি প্রভাসের মনোভাব জেনে নিলেন। প্রভাসের আপত্তি নেই। ভেতরে ভেতরে মেয়েরও খোঁজখবর নেওয়া শুরু করলেন চন্দ্রবিকাশ ধর। মেয়ে পাওয়াও গেল। নন্দনকাননের চৌধুরী বাড়ির মেয়ে। জীভন চৌধুরীর মানি-এক্সচেঞ্জের কাজকারবার। হাজারিগলিতে অফিস। জীবন চৌধুরীর একমাত্র মেয়ে অহনা চৌধুরী। চট্টগ্রাম কলেজে দর্শনে এমএ পড়ছে। সুশ্রী, লাভণ্যময়ী। মিতভাষী। অহনার বড় গুণ- তার মধ্যে সুন্দর একটা মন আছে। বন্ধু দিলীপকে দিয়ে প্রাইমারি কথাবার্তাও সেরে নিয়েছেন ধরবাবু। কনে দেখাতে রাজি হয়েছেন জীবন চৌধুরী। তারিখ নির্ধারিত হয়ে গেছে। সেনবাবুর সঙ্গে আলাপ না করে কনে দেখতে যান কী করে ধরবাবু। এক বিকেলে সেনবাড়িতে উপস্থিত হলেন চন্দ্রবিকাশ। ভূমিকা ছাড়া বললেন, 'বুঝলে প্রতুল, ছেলের বিয়ে দেব ঠিক করেছি। তোমার মতামত দরকার। তাই এলাম।'

'প্রভাসের বিয়ে দেবে! এত তাড়াতাড়ি! বিস্মিত কণ্ঠে বললেন প্রতুল সেন। চন্দ্রবিকাশ মৃদু হেসে বললেন, 'তাড়াতাড়ি দেখলে কোথায় তুমি! প্রভাসের বয়স তো কম হল না। উনত্রিশ পার হচ্ছে হচ্ছে।' একটু থেমে গলা বাড়িয়ে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ধরবাবু আবার বললেন, 'তা তোমার সংবাদ কী? একই বছরেই তো জন্ম কল্যাণের। ছেলের বিয়েয় কথা ভাবছ না?'

'এতদিন তো ভাবিনি। তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে কল্যাণকে বিয়ে করিয়ে দেওয়া উচিত। দেখি, ওর মায়ের সঙ্গে আলাপ করে। ছেলের মতামতও তো নেয়া দরকার।' বললে সেনবাবু।

'যা করবে তাড়াতাড়ি কর। শুভস্য শ্রীযুগ্ম।'

'সেনবাবু বললেন, 'তা বিয়ে সম্পর্কে কী যেন বলতে এসেছিলে?'

বলছিলাম কী- প্রভাস আমার একমাত্র ছেলে। তার মায়েরও বয়স হচ্ছে।

মায়ের বড় সাধ পূত্রবধু ঘরে আনতে। বললেন ধরবাবু। একটু ভূমিকা করেই বললেন। এরপর কন্যা ঠিক করার কথা, চৌধুরী বাড়ির প্রসঙ্গ, জীবন চৌধুরীর ঐশ্বর্যের প্রসঙ্গ, কনে অহনা চৌধুরীর কথা বিস্তারিত বললেন। অহনা যে অসাধারণ রূপবতী, মিষ্টভাষী— এসব কথাও বলতে ভুললেন না ধরবাবু। সবশেষে বললেন, 'আগামী পরশু কনে দেখার তারিখ। তুমি আর বৌদ্ধ না গেলে কনে দেখা অসম্পূর্ণ থাকবে।' 'তোমার ছেলে আর আমার ছেলের মধ্যে পার্থক্য কী? যাব, অবশ্যই যাব।' সেনবাবু ধরবাবুকে আশ্বস্ত করলেন।

দুই.

চৌধুরী বাড়ি। বিশাল ড্রইংরুম। একদিকের সোফায় ধরগিমি আর সেনগিমি, পাশের সোফায় প্রতুল আর চন্দ্রবিকাশবাবু। তাঁদের পাশে চন্দ্রবিকাশ বাবুর বন্ধু দিলীপ। মুখোমুখি সোফায় চৌধুরীবাবু মানে জীবন চৌধুরী, পাশে তার সহোদর সুকুমার চৌধুরী। পাশের সোফায় চৌধুরীগিমি এবং অহন চৌধুরী। একটু দূরে ছোট একটা কাঠের সোফায় বসেছে প্রভাস।

অহনার ঘরে ঢোকা, বসার ভঙ্গি, প্রণাম করার রীতি দেখে সবাই মুগ্ধ। চন্দ্রবিকাশ বলেই ফেললেন, 'অহনা মাকে আমাদের পছন্দ। বেয়াই মশায়ের ইচ্ছে জানলে সামনে আগাতে আপত্তি নেই আমাদের।' জীবন চৌধুরী সম্মতির হাসি হাসলেন, 'সেনগিমি বললেন, 'তাহলে ছেলেতে মেয়েতে একটু কথা বলুক।'

চৌধুরী গিমি বললেন, 'তাতে আমাদের আপত্তি নেই। আধুনিক যুগ। ওরা পরস্পরকে জেনে নিক। তারপর স্বামীর দিকে মুখ ঘুরিয়ে বললেন, 'তুমি ওদের চা-নাস্তার তদারক কর। আমি একটু ভেতর বাড়িতে যাচ্ছি।' অহনাকে সোফা থেকে তুললেন তার পর প্রভাসকে লক্ষ্য করে বললেন, 'এস বাবা।'

খাবার পর্ব চুকে গেল। সবাই নানা খোশগল্পে মাতলেন। বিয়ের দিন তারিখও ধার্য হয়ে গেল। পৌষের ১৪ তারিখে বিয়ে।

প্রতুল সেনের কী হল কে জানে, হঠাৎ বলে বসলেন, 'ছেলের বিয়েতে কিন্তু সন্তর ইঞ্চির একটা ফ্ল্যাট টিডি দিতে হবে।'

জীবনবাবু শান্তকণ্ঠে বললেন, 'আমরা সবাই শিক্ষিত মানুষ। মেয়ের বিয়েতে কী কী দিতে হবে জানি।'

'না, বললাম এজন্য যে, অনেক কন্যাপক্ষ বর পক্ষকে ঠকায়। প্রথমে বলে- হেন দেব, তেন দেব। দেওয়ার সময় অষ্টরম্ভা।

প্রতুলবাবু একটু উষ্ণতা মিশিয়ে বললেন।

'আমরা সে দলের নই।'

'তারপরও কথাটা হয়ে থাকলে ভালো।'

এই সময়ে ধরবাবু বলে উঠলেন, 'আহ প্রতুল! আমাদের তো কোনো দাবি নেই।'

'আমার আছে। প্রতুলবাবু বললেন।

এ নিয়ে একটা ফ্যাসাদ হয়ে গেল। এক কথা থেকে অন্য কথা। একটা সময়ে জীবনবাবু বললেন, 'ও ঘরে মেয়ে বিয়ে দেব না। আপনারা আসুন।'

জীবনবাবুর ভাই হই হই করে উঠলেন, 'আরে দাদা, রাগ করছ কেন? বস বস।'

জীবনবাবু ঠান্ডা গলা বললেন, 'প্রতুলবাবু ধরবাবুর আকাঙ্ক্ষার কথাই বলেছেন। ওর কথাগুলো নিশ্চয় ধরবাবুর কথা। প্রতুলবাবুর কোনো স্বার্থ নেই। ধরবাবু যা বলতে বলেছেন প্রতুলবাবু তা-ই বলেছেন। ও রকম লোভী পরিবারে আমি মেয়ে বিয়ে দেব না।'

জীবনবাবুর কথা শুনে প্রতুল সেন মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন। বড় একটা বেদনা নিয়ে সবাই বাড়িতে ফিরে এলেন।

চন্দ্রবিকাশ ধর কথার মাঝখানে প্রতুলবাবুর হঠাৎ করে সন্তর ইঞ্চির টিডি দাবি করার মাহাত্ম্য বুঝলেন না। ধর গিমিও বেকুফ বনে গেছেন। প্রভাসও এরকম দাবির কুল-কিনারা পেল না। গোটা পরিবারটাই হতভম্ব। সেনবাবুকে এর কারণ জিজ্ঞেস করার রচি খুঁজে পেলেন না ধরবাবু। যে এই পরিবারের এত নিকট বন্ধু সে প্যাঁচ মেরে বিয়েটা ভেঙ্গে দিল। একদিন, সে মাস তিনের পরে প্রতুলবাবুর মারপ্যাঁচের অর্থ খোলসা হয়ে গেল ধর-পরিবারের কাছে।

তিন মাস পরে কল্যাণের বিয়ে হল। প্রতুলবাবু ওই অহনা চৌধুরীকেই



পূত্রবধু করে ঘরে আনলেন। কনে দেখার আসরেই অহনাকে নিজের পূত্রবধু হিসেবে পছন্দ হয়ে গিয়েছিল প্রতুল সেনের। টিভির পাঁচ দিয়ে বিয়েটা ভাঙানোর উদ্যোগ নিয়েছিলেন। সফল হয়েছিলেন। ধর পরিবার স্তব্ধ স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। এত বড় চালাকি। এত বড় বেইমানি! এতদিনের ঘনিষ্ঠ প্রতুল সেন এই বড় মীরজাফর। দুই বাড়ির সীমানায় দেয়াল উঠল। মুখ দেখাদেখি বন্ধ হল। পাড়ার মানুষের মুখে মুখে এই ঘটনা কিসসার রূপ নিল। অহনা সংসার করে, সুখের সংসার। কল্যাণ তাকে আদরে-সোহাগে ভরিয়ে রেখেছে। শাশুড়ি বউমা ছাড়া কথা বলে না। প্রতুলবাবু বলেন, 'আমার এক মেয়ে শ্বশুরবাড়িতে গেছে, বদলে আরেক মেয়ে ঘরে এসেছে। অহনা আমার পূত্রবধু নয়, মেয়ে।' তার পরও অহনার ভেতরটা কেন জানি জ্বলে, এক অজানা বেদনা তাকে যেন কুরে কুরে খায়। দোতলা থেকে ধরবাড়ির সবকিছু দেখা যায়- উঠান, কলতলা, তুলসীর ঝাড়। চন্দ্রবিকাশবাবুকে দেখে, ধরগিন্নিকে দেখে আর দেখে প্রভাসকে। মাথা নিচু করে ঘরে ঢুকে, ঘর থেকে বেরোয়। কখনো ওপার দিকে মাথা তোলে। না। তুললে দেখত- অহনা নামের এক নারী কী অপরিসীম তৃষ্ণা নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে।

তিন.

স্বয়ম্বর সভা। দ্রৌপদী আজ এই সভা থেকে তার স্বামী নির্বাচন করবে। পাঞ্চাল রাজের কন্যা দ্রৌপদী। কন্যা বিবাহযোগ্য হলে স্বয়ম্বর সভার আয়োজন করেন পাঞ্চলিরাজ। দ্রৌপদী শ্যামবর্ণা, পদ্মপলাশলোচনা, কুণ্ঠিত কেশকলাপ এবং নিত্য যৌবনা। যাজ এবং উপযাজ নামের দুই ব্রাহ্মণের যজ্ঞগ্নি থেকে দ্রৌপদীর জন্ম। অযোনীসম্ভূত। রাজা পাঞ্চাল একটি আকাশযন্ত্র এবং একটি দুর্জয় ধনু নির্মাণ করালেন। ঘোষণা দিলেন- যে এই ধনুতে জ্যা যোজনা করে আকাশযন্ত্রের মাধ্যমে লক্ষ্য বস্তু বিদ্ধ করতে পারবে তাকেই স্বামী হিসেবে বরণ করবে দ্রৌপদী। ওই সভায় নানা দেশের রাজপুত্ররা উপস্থিত হয়েছে। উপস্থিত হয়েছে ধৃতরাষ্ট্রের শতগুণের সঙ্গে কর্ণ। ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে উপস্থিত হয়েছে পঞ্চপাণ্ডব। রাজ ঘোষণা শেষে কর্ণ এগিয়ে এল। কারণ সে বীর, অসাধারণ ধনুর্ধর। দীপ্তিময় দেহ তার। দীর্ঘদেহী। উন্নত নাসিকা, উজ্জ্বল নেত্র। মহাবীর অগ্রসর হয়ে ধনুতে তীর যোজনা করে। কর্ণ সূতপুত্র। একথা কারো অজানা নয়। যতই উপযুক্ত হোক, হীনজাতীয় সূতপুত্রকে তো আর বিয়ে করা যায় না। দ্রৌপদী বলল, 'কর্ণ যত বড় বলবীরশালী পুরুষই হোক না কেন, উচ্চবংশে জন্ম নয় তার। সুতরাং কর্ণ ক্ষত্রীয় কন্যার বিবাহযোগ্য পাত্র নয়। কর্ণ লক্ষ্যবস্তু ভেদ করতে সক্ষম হলেও আমি কর্ণকে বিয়ে করব না।' দ্রৌপদী কথা শুনে সভামধ্য হতে উপহাসের ধ্বনি উঠল। অপমানিত কর্ণ ক্রোধান্বিত হয়ে উঠল। ভূমিতে সজোরে ধনু নিক্ষেপ করে সভাস্থল ত্যাগ করল। তার পর সমস্ত ক্ষত্রীয় অকৃতকার্য হল। ফাঁপড়ে পড়ে গেলেন পাঞ্চলিরাজ দ্রুপদ। কন্যার স্বয়ম্বরসভা ভুল্ল হতে বসেছে। দ্রুপদ বললেন, 'সভায় উপস্থিত যে কোনোজন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।' কৃষ্ণের অনুমতি নিয়ে ছদ্মবেশী অর্জুন লক্ষ্যভেদ করল। দ্রৌপদী তাকে বরমাল্য দিয়ে বরণ করল। কিন্তু সমস্যার চূড়ান্ত সমাধান সেখানে হল না। দ্রৌপদীকে নিয়ে পঞ্চ ভ্রাতা মা কুন্তীর নিকট উপস্থিত হল। মা তখন গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করছেন। গৃহের বাহির থেকে তারা বলল- এক অপূর্ব সামগ্রী তারা ভিক্ষে করে এনেছে। ওটা নিয়ে কী করবে তারা এখন। ঘরের ভেতর থেকে কুন্তী বললেন, 'তোমরা পাঁচজনে মিলে সে জিনিস ভোগ কর।' এরপর পাঁচ ভাইয়ের সঙ্গে দ্রৌপদীর বিয়ে হয়। ভ্রাতৃগণের মধ্যে স্থির হয়- দ্রৌপদী এক একজন পান্ডবের সঙ্গে এক বছর করে বাস করবে, তখন অন্য ভাইয়েরা দ্রৌপদীর সঙ্গে ভাসুরের মতো আচরণ করবে। তারপর তো দ্রৌপদী আর পঞ্চপাণ্ডবের জীবনে কত উত্থালপাতাল। কত নিগ্রহ, কত নির্যাতন, কত কপটতা, কত দূরভীসন্ধি। এবং সবশেষে যুদ্ধ, কুরুক্ষেত্রের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। কুরুক্ষেত্রের বিপরীত প্রান্তে তাঁবু পড়েছে। এক প্রান্তে কুরুসৈন্য, দুর্যোধন-



সেই বিকেলে এক পর্যায়ে হাতটা ধরেছিল প্রভাস। মা এনে তার ঘরে বসিয়ে দিয়েছিলেন দুজনকে। বলেছিলেন, 'তোমরা কথা বল। আমি একটু ওদিকটা দেখি।' বলে মা সরে গিয়েছিল ঘর থেকে। কী সুন্দর মিষ্টি করে কথা বলেছিল প্রভাস। বলেছিল, 'খুব ধনী নই আমরা। তবে তুমি অসুখে থাকবে না। তোমাকে আজীবন ভালোবেসে যাব আমি।' বলে অহনার ডান হাত নিজের দিকে টেনে নিয়েছিল প্রভাস। সেই স্পর্শ, এই এত দিন পরেও অহনার হাতে লেগে আছে। মাঝে মাঝে হাত বোলায় সেই স্পর্শিত অংশে। কল্যাণ তাকে পরম সুখে রেখেছে। শ্বশুর-শাশুড়ির তুলনা নেই। তারপরও মনের মধ্যে খোঁচাখুঁচি। মাঝে মধ্যে মনে হয়- কল্যাণ না হয়ে তার স্বামী প্রভাস হলেই ভালো হতো

দুঃশাসন-এরা। অন্যদিকে পান্ডব তাঁবু। সৈন্যসামন্ত, কৃষ্ণ, দ্রৌপদী, পঞ্চপাণ্ডব এবং স্বপক্ষে সসৈন্য রাজন্যবর্গ। গোটা দিন রণদামামা। রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। হাজার সৈন্যের প্রাণপাত। কুরুক্ষেত্রের প্রথম সেনাপতি ভীষ্ম। দশ দিন যুদ্ধ করে শরশয্যা গ্রহণ করলেন ভীষ্ম। এরপর সেনাপতি হলেন দ্রোণ। দ্রোণের মৃত্যুর পর যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব পড়ল কর্ণের ওপর। যুদ্ধক্ষেত্রে কর্ণ অপ্রতিরোধ্য। দৌর্দণ্ডপ্রতাপ সে গোটা যুদ্ধক্ষেত্র দাঁপিয়ে বেড়ায়। রথী, মহারথীরা তার সামনে দাঁড়াতে পারে না। অর্জন ছাড়া অন্যান্য পান্ডব কর্ণের হাতে পরাস্ত হয়েছে। যুদ্ধক্ষেত্রের কথা পান্ডব শিবির পর্যন্ত পৌঁছে যায়। দিনান্তে শিবিরে পরামর্শসভা বসে। সেখানে কর্ণের শৌর্যবীর্যের কথা আলোচিত হয়। দ্রৌপদীর ভেতরে আলোড়ন ওঠে। কীসের যেন ঝড় বইতে থাকে দ্রৌপদীর হৃদয়ে। এ কীসের মন্বন অনুভব করছে দ্রৌপদী? ভেবে কুল পায় না। কনের বীরত্ব গাথা শুনে দ্রৌপদীর খুশি হবার কথা নয়। কিন্তু কেন জানি কর্ণকথা শুনে দ্রৌপদীর উল্লাস বোধ হয়। কেন? কেন? দ্রৌপদী একা বসে ভাবে- এই কর্ণ তো একদা তার হবার কথা। স্বয়ম্বরসভায় সে তো তার বীর্যবত্তার পরিচয় দিতে উদ্যত হয়েছিল। ও যে সত্যি সত্যি একজন মহাবীর, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে সে তার প্রমাণ দিয়ে যাচ্ছে। এ রকম একজন প্রবল প্রতাপী মানুষ তার স্বামী হলে দোষের কী ছিল? কিন্তু সেদিন যে তার কী হয়েছিল? হীনজাতের দোহাই দিয়ে কর্ণকে প্রত্যাখ্যান করেছিল সে। আর কী আশ্চর্য! সেই হীনজাতের কর্ণের জন্য তার হৃদয়ে এত তোলপাড় হচ্ছে। আহা কর্ণকেও যদি স্বামী হিসেবে পাওয়া যেত। পাঁচজনের জায়গায় না হয় ছয়জন হতো। যদি কর্ণকে ছা দয়ের কাছে পাওয়া যেত, পরম ভূক্তি পাওয়া যেত। এরকম ভাবনা দ্রৌপদীকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে, আনমানা করে। পঞ্চস্বামীর



সামনে নিজেকে খুব ক্ষুদ্র মনে হয়। নিজেকে সংযত করার আশ্রয় চেষ্টা করে যায় দ্রৌপদী। স্বামীদের সঙ্গে, পুত্রদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে থাকে দ্রৌপদী।  
যুদ্ধ একসময় শেষ হয়। পাণ্ডবদের জয় হয়। কিছুদিন রাজ্যাশাসন করে পাণ্ডবরা স্বর্গযাত্রা করে। সঙ্গে দ্রৌপদী।

চার.

অহনা ভেতরে ভেতরে অবিন্যস্ত হতে থাকে। এক ধরনের বিবর্ণ বিপর্যস্ততা অহনাকে বিধ্বস্ত করতে থাকে। রক্তক্ষরণ হতে থাকে অহনার মস্তিষ্কে, হৃদয়ে।

কল্যাণের সঙ্গে ঘর করছে অহনা। কল্যাণ তাকে গভীর ভালোবাসে। তার আচরণে সোহাগে কোনো কমতি নেই। তারপরও অহনার অন্তরে কীসের যেন অভাব। কীসের অভাব, কার অভাব? কে সে? সে কি প্রভাস? তার প্রথম দেখা পুরুষ, প্রথম হাত ধরা পুরুষ?

সেই বিকেলে এক পর্যায়ে হাতটা ধরেছিল প্রভাস। মা এনে তার ঘরে বসিয়ে দিয়েছিলেন দুজনকে। বলেছিলেন, 'তোমরা কথা বল। আমি একটু ওদিকটা দেখি।' বলে মা সরে গিয়েছিল ঘর থেকে। কী সুন্দর মিষ্টি করে কথা বলেছিল প্রভাস। বলেছিল, 'খুব ধনী নই আমরা। তবে তুমি অসুখে থাকবে না। তোমাকে আজীবন ভালোবেসে যাব আমি।' বলে অহনার ডান হাত নিজের দিকে টেনে নিয়েছিল প্রভাস। সেই স্পর্শ, এই এত দিন পরেও অহনার হাতে লেগে আছে। মাঝে মাঝে হাত বোলায় সেই স্পর্শিত অংশে। কল্যাণ তাকে পরম সুখে রেখেছে। শ্বশুর-শাশুড়ির তুলনা নেই। তারপরও মনের মধ্যে খোঁচাখুঁচি। মাঝে মধ্যে মনে হয়- কল্যাণ না হয়ে তার স্বামী প্রভাস হলেই ভালো হতো। কী দারুণ শান্ত স্বভাব প্রভাসের। কখনো উঁচু গলা শোনা যায় না তার। পাড়াতো ননদিনী বলে- প্রভাসদার তুলনা নেই। পাড়ার সবাই মানিয়াগণ্য করে তাকে। স্বভাবচরিত্র খুবই ভালো প্রভাসদার। কল্যাণও ভালো। তবে অল্পতে রেগে যায়। তখন তার হুঁশ থাকে না। চিৎকার চেষ্টামেচি করে। আহা প্রভাস যদি তার হতো, কতই না ভালো হতো।

পাঁচ.

পরীক্ষিতের হাতে রাজ্যভার অর্পণ করে পাণ্ডবরা মহাপ্রস্থানের পথে যাত্রা করে। তারা হিমালয়, বালুকর্ণব, মেরু পর্বত পার হতে থাকে। একদিন পথে দ্রৌপদী পতিত হয় এবং মৃত্যুবরণ করে। ভীমসেন যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞেস করে, 'দ্রৌপদীর অকাল মৃত্যুর কারণ কী?' যুধিষ্ঠির বলেন, 'অর্জুনের প্রতি দ্রৌপদীর পক্ষপাতিত্ব ছিল। তাছাড়া...।' 'তা ছাড়া কী, দাদা?' ভীম আবার জিজ্ঞেস করে। 'কর্ণের প্রতি প্রচণ্ড দুর্বলতা পোষণ করত দ্রৌপদী, মনে মনে। এটা অপরাধ। এই অপরাধেও দ্রৌপদীর অকালে মৃত্যু হল।' ধীরস্থির কণ্ঠে বললেন যুধিষ্ঠির।

ভীম স্তম্ভিত।

অহনা আসন্ন সন্তান প্রসবা। গত কদিন ধরে খুব কষ্ট পাচ্ছে। ম্যাটারনিটিতে ভর্তি করানো হয়েছে। ডাক্তার বলেছেন- ক্রিটিকেল অবস্থা। দুজনকে বাঁচানো যাবে না। মায়ের অবস্থা সন্তানের চেয়ে খারাপ। অহনা মাঝে মধ্যে হুঁশ হারাচ্ছে।

কল্যাণকে একা পেয়ে বলল, 'আমি বাঁচব না কল্যাণ। মরার আগে আমি আমার একটা ইচ্ছে পূরণ করতে চাই।'

'কী ইচ্ছে? কী ইচ্ছে তোমার? আমাকে বল।' কল্যাণ উদ্গ্রীব কণ্ঠে বলে। অহনা কঁকানো গলায় বলে, 'তোমার পক্ষে কঠিন হবে আমার বাসনা পূরণ করা।'

কল্যাণ বলল, 'বল তুমি। যত কঠিনই হোক তোমার ইচ্ছা পূরণ করব আমি।'

অহনা নিশ্চুপ। অনেকক্ষণ কোনো কথা বলে না। হয়তো কথা বলার শক্তি ফুরিয়ে গেছে তার অথবা বাসনার কথাটা বলার জন্য শক্তি সঞ্চয় করছে। এই সময় কল্যাণ বলে উঠল, 'অহনা, তুমি আমার স্ত্রী। তোমার আকাঙ্ক্ষা পূরণের দায়িত্ব আমার। বল, তোমার কী বাসনা?'

'আমি মরার আগে প্রভাসকে একনজর দেখতে চাই।' শান্ত স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলল অহনা।

কল্যাণ হতবাক। ৪৩

